মেহেরপুরে বিএনপি প্রার্থীদের পরাজয়ের নেপথ্যে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ আসনের ফলাফল শুধু রাজনৈতিক পালাবদল নয়, এটি একটি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত। দীর্ঘদিনের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইয়ের মাঠে এবার জিতেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী; ভরাডুবি হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির।

মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধান বলছে, ভোটাররা কেবল প্রার্থী নয়; আচরণ, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির ওপর রায় দিয়েছেন।

২০০১ সালে বিএনপির প্রার্থী মাসুদ অরুণ প্রায় ১ লাখ ২ হাজার ভোট পেয়ে জয়ী হন। ২০০৮ সালে একই অঞ্চলে জামায়াত প্রার্থী পান মাত্র ৩৪ হাজার ভোট। কিন্তু এবার জামায়াত প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান পেয়েছেন ১ লাখ ২১ হাজার ৪৬১ ভোট, বিএনপি প্রার্থী পেয়েছেন ১ লাখ ৪ হাজার ৭৮৭ ভোট। প্রশ্ন উঠছে, এই বিপুল ভোট এলো কোথায় থেকে?

স্থানীয় বিশ্লেষকদের মতে, এটি কেবল দলীয় ভোট স্থানান্তর নয়; বরং ‘নতুন ভোটার সক্রিয়তা’, বিশেষ করে নারী ভোটারদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং নীরব ভোটারের প্রত্যাবর্তন এবং বিএনপির প্রান্তিক পর্যায়ের নেতা-সমর্থকদের অতি বাড়াবাড়ি ছাড়াও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দলের প্রার্থীকে পরাজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সংগঠনিক দূর্বলতা, দলীয় অন্তর্কলহ, ৫ আগস্ট পরবর্তী জেলা-উপজেলা, ইউনিয়ন ও পাড়া-মহল্লার নেতাকর্মীদের অবাধ্য আচরণ। হাট-বাজার, খাল-বিল দখল, মামলার ভয় দেখিয়ে আর্থিক সুবিধা ভোগ মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। এসবের জবাব দিয়েছে ভোটাররা ব্যালটের মাধ্যমে। আগস্ট ২০২৪ পরবর্তী মেহেরপুরে বিএনপির নতুন কমিটিতে সাবেক এমপি মাসুদ অরুণসহ গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন না করায় দলে বিরোধ শুরু হয়। নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান পক্ষ ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ পক্ষ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে একে অপরের বিরোধীতা করে সভা সমাবেশে বক্তব্য রাখে। একপর্যায়ে মাসুদ অরুণ দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর কামরুল পক্ষ বিরোধী শিবিরেই রয়ে যায়। যা নির্বাচনে পরাজয়েরও একটি কারণ। তৌফিকুল

ইসলাম নামের একজনের ফেসবুক আইডি থেকে একটি ৪১ সেকেন্ডের কল রেকর্ড ভাইরাল হয়েছে। তাতে শোনা যায় কামরুল ইসলাম দাড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

একাধিক ব্যবসায়ী, ইজারাদার ও গ্রামবাসীর অভিযোগ- ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বিএনপির কিছু তৃণমূল নেতা হাট-বাজার, খাল-বিল ও স্থানীয় সম্পদ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় মামলাভীতি, সামাজিক চাপে অর্থনৈতিক সুবিধা নেওয়া এবং বিরোধী মতের লোকজনকে ‘১২ ফেব্রুয়ারির পর দেখে নেওয়া’ এমন কথাবার্তা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও জেলা বিএনপি নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে এসব অভিযোগ নাকচ করেছে, তবুও তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণহীনতা স্পষ্ট ছিল বলে স্বীকার করেছেন দলটিরই কয়েকজন সাবেক দায়িত্বশীল নেতা।

একজন ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা বলেন, দল তখন সংগঠন গোছানোর চেয়ে প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত ছিল, এটাই ভুল।

এদিকে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্য শোডাউনের বদলে ওয়ার্ডভিত্তিক সংগঠন পুনর্গঠন করে। স্থানীয় মসজিদকেন্দ্রিক যোগাযোগ, অসুস্থ-অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো, চিকিৎসা-সহায়তা, শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ, এসবের মাধ্যমে তারা সামাজিক আস্থা তৈরি করে।

একজন স্কুল শিক্ষক বলেন, তারা বড় মিছিল করেনি, কিন্তু ঘরে ঘরে গেছে। মানুষ সেটা মনে রেখেছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিএনপি যখন ‘ক্ষমতার পরবর্তী প্রভাব’ নিয়ে ব্যস্ত, জামায়াত তখন ‘নির্বাচনের প্রস্তুতি’ নিয়েছে। এবারের নির্বাচনে চোখে পড়েছে নারীদের দীর্ঘ লাইন। বিশেষ করে যেসব পরিবার অতীতে রাজনৈতিক ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যেত না, সেইসব নারীরা এবার প্রকাশ্যে ভোট দিয়েছেন। কয়েকটি কেন্দ্রে বিএনপি-বিরোধী পুরুষ কর্মীদের অনুপস্থিতি থাকলেও নারীদের উপস্থিতি ছিল দৃশ্যমান।

বিশ্লেষকদের মতে, নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতি- এই দুই প্রশ্ন নারী ভোটারদের সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা রেখেছে। এটিকেই অনেকে বলছেন ‘ভোট বিপ্লব’-এর নীরব চালিকাশক্তি। বিভিন্ন কেন্দ্রে দেখা গেছে, বিএনপি বিরোধী পরিচিত পুরুষ নেতাদের উপস্থিতি কম।

স্থানীয়দের ধারণা, ভীতি এড়াতে তারা প্রকাশ্যে আসেননি। তবে তাদের পরিবারের সদস্যরা ভোট দিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, ভোটাররা

প্রকাশ্য অবস্থানের বদলে গোপন ব্যালটে মত প্রকাশে স্বস্তি পেয়েছেন। কিছু গ্রামে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, বাড়ি থেকে গবাদিপশু নিয়ে যাওয়া, সম্পদ দখলের অভিযোগ, এসব ঘটনা সাধারণ মানুষের মনে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। অনেকেই প্রকাশ্যে কথা বলতে চাননি; তবে অফ দ্য রেকর্ড স্বীকার করেছেন, ভোট দিয়েছি ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ভেবে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলেন, যখন ভোটার মনে করেন ফলাফলের পর তার সামাজিক নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে পারে, তখন তিনি ‘সবচেয়ে কম ঝুঁকির’ বিকল্পকে বেছে নেন। বিএনপির জেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রান্তিক নেতাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, এমন অভিযোগ দলটির ভেতরেও আছে। অন্তর্কলহ, কমিটি বাণিজ্যের অভিযোগ, ত্যাগী কর্মীদের অবমূল্যায়ন, এসব দীর্ঘদিনের ক্ষোভ নির্বাচনে বিস্ফোরিত হয়েছে বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

অন্যদিকে মেহেরপুর-২ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মো. নাজমুল হুদা ৯৬ হাজার ৩০৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এই আসনে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মো. আমজাদ হোসেন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮৫ হাজার ৯৮৮ ভোট।

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের একটি নিজস্ব ভোটব্যাংক আছে। তাকে দলীয় মনোনয়ন না দেওয়াতে তিনিসহ তার সমর্থকদের দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সেভাবে মাঠে নামতে দেখা যায়নি। ফলে তার সমর্থকরা প্রকাশ্য শ্লোগান নয়, আচরণের হিসাব কষেছেন। ক্ষমতার সময়ের ব্যবহার, তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক, এবং নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তার আশ্বাস এই তিন উপাদান নির্ধারণ করেছে গাংনীর ভোটের ফলাফল।

বিএনপির জন্য এটি আত্মসমালোচনার সময়; জামায়াতের জন্য এটি আস্থা ধরে রাখার পরীক্ষা। মেহেরপুরে এবার ভোট ছিল নীরব, কিন্তু রায় ছিল উচ্চকণ্ঠ।

পরাজয়ের গন্ধ পেয়ে আমাদের বিপক্ষে অপপ্রচার করা হচ্ছে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির ও মনোনীত প্রার্থী তাজউদ্দিন খান বলেছেন, পরাজয়ের গন্ধ পেয়ে আমাদের বিপক্ষে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, আমাদের বোনেরা কোরআন হাতে শপথ দিচ্ছে। এ দেশের জনতা কি এসব বিশ্বাস করবে?

তিনি বলেন, এ দেশের জনতা অবস্থান নিয়েছে চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে, টেন্ডারবাজদের বিরুদ্ধে এবং দখলদারদের বিরুদ্ধে। আগামী ১২ তারিখে জনগণ প্রমাণ করে দেবে আগামীর বাংলাদেশ কেমন হবে।

সোমবার বিকেল ৪টার দিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত নির্বাচনী গণমিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

জেলা জামায়াতের আমির আরও বলেন, ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিকদের পর্যন্ত মোবাইল ফোন নিয়ে যেতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আমরা এটিকে একটি ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মনে করছি। মানুষ যেন স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে এবং কে কীভাবে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দখলদারিত্ব করতে চায় তা ক্যামেরার মাধ্যমে জাতির সামনে তুলে ধরা যেত। আপনারা যদি সত্যিই সুষ্ঠু নির্বাচন চান, তাহলে অবাধ তথ্যপ্রবাহের সুযোগ দিতে হবে।

বিশাল এই নির্বাচনী গণমিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর শূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।